মুখবন্ধ

আমাদের দেশে কিংবদন্তিতে রয়েছে: রাজা গোপাল ও সুলতান হোসেন শাহ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে দুটি স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করেন। প্রায় সব আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কোনো এক ধরনের নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের মোকাদ্দম বা গ্রামপ্রধান, পাটোয়ারি বা কর আদায়কারী নির্বাচন করত। গ্রাম মোকাদ্দমদের পরামর্শক্রমে পরগনা কাজি ও থানাদার নিযুক্ত হতেন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ গ্রাম পঞ্চায়েতব্যবস্থা বিলোপ করলেন। উনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত তা আনুষ্ঠানিকভাবে টিকে ছিল।

আমাদের ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের শেকড় খোঁজার কাজ চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নেই। বাস্তবে অবশ্য আমরা এখন দেখছি, গণতন্ত্রের পুরো আদল, তার চোখ-কান-মুখ সব প্রতীচ্য থেকে আগত। আক্ষরিক অর্থে গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত গণতন্ত্র হচ্ছে 'demos' এর 'kratos' অর্থাৎ জনগণের শাসন। গ্রিসে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ শাসন বোঝাত। যেসব নগররাষ্ট্রে এই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে, সেই সব রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কদাচিৎ ১০ হাজারের বেশি ছিল। নারী ও দাসের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নাগরিকেরা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারত; আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ ও আইনের বিচারের ক্ষেত্রে এখতিয়ার বা ক্ষমতার কোনো ফারাক ছিল না। এই গ্রিক ঐতিহ্য অতি স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। সোলন, লাইকারগাস ও পেরিক্লিসের গণতন্ত্রে আধুনিক গণতন্ত্রের কিছু কিছু রেশ দেখা যায়। গ্রিক দার্শনিক পণ্ডিতদের কাছে গণতন্ত্রের অবশ্য তেমন কোনো কদর ছিল না। সক্রেটিস গণতন্ত্র অপছন্দ করতেন, প্লেটো মূর্খের শাসন বলে গণতন্ত্র ঘৃণা করতেন এবং অ্যারিস্টটল একে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করতেন। জাতি-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে ঐতিহ্যগত নির্বাচন-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে। নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৮৬৮ সালে পৌর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত সদস্যের সমন্বয়ে পাশ্চাত্য ধরনের পৌর কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। তখন শুধু পৌর করদাতাদের সদস্য নির্বাচিত করার অধিকার ছিল। ১৮৮৪ সালে প্রবর্তিত আইনবলে ঢাকাসহ গুরত্বপূর্ণ পৌরসভাগুলো নির্বাচনী ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। একই আইনে আংশিক নির্বাচন ও আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে জেলা কমিটি ও স্থানীয় বোর্ডগুলো গঠিত হয়। পৌর ও গ্রাম এলাকায় এই সীমিত নির্বাচনী ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই গ্রামপর্যায়ে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের নতুন পর্বের সূচনা হয়।

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভায় নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। তখন সম্প্রদায় ও পেশার ভিত্তিতে নির্বাচন শুরু হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ভোটাধিকার ও নির্বাচনী সংস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯২০ সাল থেকে অনিয়মিতভাবে হলেও পৃথক নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়, পৌরসভা ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ছাড়াই প্রার্থীরা ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পৌরসভা, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি ও বোর্ডে নির্বাচিত ও মনোনীত—উভয় ক্ষেত্রেই জমিদারদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এমনকি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেও তাদের প্রভাব বজায় ছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত করে। পরবর্তীকালে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকেনি।

নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং ১৯৫৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান প্রবর্তনে নির্বাচন-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ ও জেলা বোর্ড নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে নবীন ও অনাবাসিক আইনজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করেন। ষাট ও সত্তরের দশকে পেশাদার

রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৮-১৯৬৯) ও ছয় দফার আন্দোলন (১৯৬৬-১৯৭১) নির্বাচনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ না করায় পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং যেকোনো আইন বা সংবিধানের যেকোনো বিধানের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। বিরোধী সংসদ সদস্যের সংখ্যা অতি নগণ্য থাকায় সরকারি দল সহজেই সংবিধানের চারটি সংশোধনী পাস করে। চতুর্থ সংশোধনীর বলে সংসদীয় প্রথা বিলোপ করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কারণে দেশে এক শূন্যতা বিরাজ করে। নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়। দারুণ এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। 'হ্যাঁ-না' বা ন্যাটো নির্বাচন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইনসিদ্ধ ও বৈধকরণের এক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে প্রথমবারের মতো নির্বাচনের ইতিহাসে সন্ত্রাস যুক্ত হয় এক নতুন উপাদান হিসেবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সশস্ত্র ক্যাডার লালন করা শুরু করে। এদের কাজ হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ভোট সংগ্রহ, নির্বাচনকেন্দ্র দখল এবং প্রয়োজনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই। বর্তমানে অত্যন্ত তিক্ততার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করা হচ্ছে। অবাধ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানও এখন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ জুন ও ২০০১ সালে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন হয়। বাংলাদেশে অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উচ্চারিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই দাবি ওঠে রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়ার একটি অহিংস বিকল্প হিসেবে। ২০ নভেম্বর ১৯৮৩ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 'কেয়ারটেকার' সরকারের প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করে এবং এ জন্য একটি ফর্মুলাও উপস্থাপন করে। ওই দাবি তেমন সমর্থন পায়নি। সাধারণ নির্বাচন তদারকির জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি আবার উত্থাপিত হয় ১৯৯০ সালে।

৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ জেনারেল এরশাদ তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটগুলোর প্রস্তাবিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' জন্য যৌথভাবে 'ফর্মুলা' গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশনামতো তৎকালীন ডাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন এবং তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ডাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে জেনারেল এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে ডাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেন। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধানবহির্ভূত সব কর্মকাণ্ডকে একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়।

৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশে ১৬ বছর পর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকলেও সেই নির্বাচিত ষষ্ঠ সংসদ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে দেশে অচলাবস্থা দূর করে। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী গত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে দুটি নির্বাচনের তদারকি করে। রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং দেশের আইনকানুন ও রেওয়াজ মানার অভ্যাসগত প্রবণতা থাকলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো বিশেষ ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠত না।

নির্বাচন নিয়ে অতীতে বহু দেশে সংঘর্ষ হয়েছে। জনরোষে নির্বাচনের ফলাফল অকার্যকর বা বাতিল হয়ে গেছে অনেক দেশে। আবার গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায়ও তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এবং ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামে খ্যাত প্রতিবেশী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জনজাতিগত সংঘাত-সংঘর্ষ প্রায়শ ঘটে থাকলেও নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানেও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে হুজুগে বাঙালিরা কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। নির্বাচন কমিশনকে বারবার হেনস্তা করা হয়েছে। ফুটবল খেলা নিয়ে ইংরেজ দর্শকেরা ক্রীড়াসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছুড়ে ফেলে দিয়ে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে, আমাদের কাছে তেমন আচরণ অকল্পিত নয় বলেই আমরা 'ভোট ডাকাতি' কথাটির প্রচলন করেছি।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে দেশে যে বিরল ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার সুযোগ নিয়ে নতুনভাবে সংবিধান প্রণয়ন করে আমরা স্থায়ী সমাধান খুঁজিনি। পরিশ্রমকাতর সহজ সমাধান-অভিলাষী ক্ষমতার সোপানে আরোহণের জন্য অস্থির নেতারা জোড়াতালি দিয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নব্বইয়ের মাঝামাঝি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে মধ্যস্থতা করতে বলেন। তারপর বহু অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের সম্মুখীন হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

এক পক্ষ বাধ্য হয়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে।

যারা ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রণয়ন করে, তাদের ২০০৪ সালে সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টার বয়সের মেয়াদ বৃদ্ধিতে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সেই ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান দুবার প্রয়োগ করার পর তৃতীয়বার সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমরা কি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রেখে, দেশের আইনকানুন মেনে এবং নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ সহযোগিতা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মহাযজ্ঞ ভবিষ্যতে নির্বাচিত নেতাদের তত্ত্বাবধান ও পৌরহিত্যে পালন করতে পারব? আমাদের দেশে একটা কথা আছে—লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। আমাদের কোটি কোটি টাকা না হলে নির্বাচনও হয় না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার উপরিউক্ত প্রশ্নটি লক্ষ-কোটি টাকার প্রশ্ন, যার উত্তর আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।'

জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সব নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমাদের দেশে নির্বাচনের যে আইনি কাঠামো রয়েছে, তা কাজ চালানোর জন্য খারাপ নয়। সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা যথার্থভাবে পালন করলে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কঠিন হয় না। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের কথাটা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পর্কে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা ঔদাসীন্য নির্বাচন কমিশনকে পঙ্গু করে দেয় এবং একটা শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কঠিন হয়ে পড়ে। নির্বাচনে কে জিতবে বা হারবে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেই দুর্ভাবনা না করে প্রধান নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্তব্যচ্যুতিকে সাহস ও কঠোরতার সঙ্গে মোকাবিলা করা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করার অন্য কোনো উপায় নেই।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা করা এবং এ-সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য। তাই আইনের বিধানগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২', নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা এবং আচরণ বিধিমালা প্রণীত হয়।

২০০৭-০৮ সালে প্রায় দুই বছর ধরে অনির্বাচিত, জরুরি অবস্থার মধ্যে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই দেশ পরিচালনা করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্বাচনী আইন সংস্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের আগে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয় বলে একাধিকবার দাবি করে। কিন্তু জরুরি অবস্থা জারির আগে রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন, যার কারণে একটি বিতর্কের জন্ম হয়।

জরুরি অবস্থা জারির আগে রাষ্ট্রপতি যে নির্বাচন কমিশন গঠন করেন, সেটিও বিতর্কিত হয়ে পড়ে এবং এই নির্বাচন কমিশন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সমগ্র দেশের জন্য একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রণয়নে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজনীতি ক্রমে একটি সাংঘর্ষিক অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। অবশেষে সংস্কারের ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ করা প্রয়োজন, যাঁর নামে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন এবং যে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের তদারক করেন, তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যথাসময়ে এসব হত্যার বিচার হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্র বর্জনের কারণে তা অচল হয়ে যায়। সংসদের পরিবর্তে রাজপথে সব সমস্যার ফয়সালা করার চেষ্টা করা হয়। ভাবাবেগে আত্মগর্বের অতিরঞ্জন এবং নেতাদের স্তাবকতা আমাদের কোনো সাহায্য করেনি। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা কোনো দেশ গ্রহণ করেনি। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড দীর্ঘায়িত ও জটিল করে ফেলেছি। এমতাবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা এবং দেশ কী কী সাংবিধানিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

বাংলাদেশ অতীতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সাধারণভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে আগামী নির্বাচন সমস্যাপূর্ণ হতে পারে—এই উদ্বেগের অবসান হওয়া উচিত। একই সঙ্গে মানুষকে জানাতে হবে ভোটের শক্তি ও মহিমা কী। আমাদের জানতে হবে, কার পক্ষে, কিসের ভিত্তিতে এবং কেন আমরা ভোট দেব। নির্বাচিত ব্যক্তির অপকার করার ক্ষমতা অশেষ। গত প্রায় ৪০ বছরে আমাদের জীবনে একাধিকবার আমরা তা লক্ষ করেছি।

২০০৮ সালের নির্বাচন আমাদের জন্য সম্পূর্ণই এক নতুন অভিজ্ঞতা। নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সংস্কার, রাজনৈতিক দলের সংস্কার, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধীকরণ, ছবিসহ

ভোটার তালিকা প্রণয়ন, প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্তকরণ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণসহ নানা কারণে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল। আর এসব ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের অন্যতম সংগঠন 'সুজন'-সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'সুজন' ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, ২০০১ সালের সাড়ে সাত কোটি ভোটারের নাম তারা ওয়েবসাইটে দিয়ে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সংকলিত তথ্যভান্ডার সৃষ্টি করেছিল, যাকে উপলক্ষ করে বিখ্যাত *টাইম* ম্যাগাজিনে বাংলাদেশের এসব 'ডেমোক্রেসি এক্টিভিস্টদের' কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। 'সুজন' হাতে-কলমে দেখিয়েও দিয়েছিল ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পদ্ধতি।

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে এ দেশের অনেক রাজনীতি-সচেতন মানুষ খবরের কাগজে অনেক লিখেছেন। কিন্তু সুজন যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্কার আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়, সে সময় আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সংস্কারের দাবি এবং তা নাকচ করার বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার বিষয়টি তখন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না।

'সুজন' প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ক্ষেত্রে আলোচনার অবতারণা করে। একই সঙ্গে 'সুজন' রাজনৈতিক দলের সংস্কারের বিষয়েও সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন এবং এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের সাহায্যে জনমত সৃষ্টিরও উদ্যোগ নেয়। এই লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন এবং নির্বাচনী অলিম্পিয়াড, নির্বাচনী বিতর্ক ও নির্বাচনী মজলিশের মতো অনেকগুলো সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। এই প্রক্রিয়ায় সারা দেশে হাজার হাজার সচেতন ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তি 'সুজন'-এর কার্যক্রমের সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সম্পৃক্ত হন। এই প্রক্রিয়ায় তরুণসমাজও আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছে। এভাবে নবম সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার লক্ষ্যে এক নতুন 'সংস্কার আন্দোলনের' সূচনা হয়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের সংস্কারের লক্ষ্যে কতগুলো সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 'সুজন' বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করার উদ্যোগ নেয়, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। বস্তুত, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার অধিকার 'সুজন'-এর প্রচেষ্টায় ও আদালতের নির্দেশে নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছাড়াও ভোটারদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করার প্রচেষ্টা পৌরসভা এবং ২০০৪-০৫ সালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনেও অব্যাহত রাখা হয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি আসনের জন্য তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এটি জনগণের সচেতনতার স্তর উন্নীত করে বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নতুন এক মাইলফলক উন্মোচন করে। 'সুজন'-এর অব্যাহত চাপ ও নির্বাচনকালীন প্রার্থীদের সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশ, ভোটারদের সচেতনতা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সবার মনেই নতুন আশাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। তথ্যের যে অপার ক্ষমতা এবং তথ্যের ভিত্তিতে নাগরিক মনে যে ইতিবাচক ক্ষমতায়ন সম্ভব, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। আর নির্বাচন সম্পর্কে প্রার্থীদের হলফ করে তথ্য প্রদান এবং এর বিশ্লেষণ বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে তো বটেই, একই সঙ্গে তা অন্যান্য দেশের জন্যও এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তাই এসব তথ্যের সমন্বয়ে যে তথ্যভান্ডার সৃষ্টির উদ্যোগ 'সুজন'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সব 'সু'-জনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেওয়া হয়েছে, আমি আন্তরিকভাবে সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। নির্বাচন সম্পর্কে নাগরিক মনে সচেতন দৃষ্টিকোণ রচনায় নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ নতুন এক মাত্রা সংযোজন করবে, যা আমাদের ঐতিহ্যগত গণতন্ত্রের শেকড় খোঁজার চিত্তাকর্ষক কাজটিকে নতুন বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে, সবার মনে নতুন এক আশাবাদের সঞ্চার করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমি কামনা করি, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে 'সুজন'-এর এ ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও সাহসী প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। আরও কামনা করি, এই নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ফসল ও জনমানুষের অভিজ্ঞতা, এই সমন্বিত অর্জিত বিশেষ জ্ঞান থাকুক বিশ্বের নির্বাচনী পরিসর তথা গণতন্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম এক মাইলফলক হয়ে!

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সাবেক প্রধান বিচারপতি ও ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের
প্রধান উপদেষ্টা